ঐতিহাসিক সূত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আলোকে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রসনাবিলাস

মোঃ শাহীন আলম *

সারসংক্ষেপ : সাধারণ অর্থে বলতে গেলে মানুষ তার জীবন ধারণের জন্য যা খায় বা গ্রহণ করে সেটাই খাদ্য। বিশ্বের নানা স্থানের মানুষ খাবার হিসেবে যাই গ্রহণ করুক না কেন সেক্ষেত্রে মুখ্য উপাদান হিসেবে উদ্ভিজ ও প্রাণিজ অংশ উপস্থিত থাকে। বিশেষ স্থানের প্রকৃতি ও পরিবেশে যে ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় এবং প্রাণিদের মধ্যে যা পাওয়া যায় তার থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক এবং নির্বাচিত অংশ মানুষ তার খাদ্য তালিকায় স্থান দেয়। এদিক থেকে বিচার করলে ভৌগোলিক অবস্থা ও পরিবেশভেদে মানুষের খাদ্যাভ্যাস নির্ধারিত এবং পরিবর্তিত হতে পারে। মানুষ উদ্ভিজ ও প্রাণিজ উপাদান হিসেবে তার খাদ্য তালিকায় যেগুলোকে স্থান দেয় তা মূলত শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ নিয়ে গঠিত। এ উপাদানগুলো মানুষ খাবার হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে তার পুষ্টি ও জীবনধারণ নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের ভূমিরূপ, প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছে। প্রাচীন বাংলায় যে সব শস্য উৎপাদিত হয়েছিল এবং যে ধরনের প্রাণিকে মানুষ গৃহপালনের আওতায় আনতে পেরেছিল কিংবা শিকার করতে পারত তা তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সরাসরি কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। পাশাপাশি প্রাচীন আমলে বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে লিখিত ও কোনো সরাসরি সূত্র নেই। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে বিভিন্ন ইতিহাসের সূত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে একটি অনুমিত যৌক্তিক ধারণা স্থির করা হয়েছে।

সূচক শব্দ ঃ খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব।

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গেলে সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় প্রাচীন যুগ নিয়ে। বিশেষ করে সমকালীন লিখিত কোনো গ্রন্থ না থাকা এক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি ঐ সময়ের রাজাদের বিভিন্ন প্রশস্তি ও ভূমিদানের যে দলিল সেগুলো নানা প্রাচীন ভাষায় রচিত। এই ভাষাগুলো সম্পর্কে সিংহভাগ ইতিহাস গবেষকের তেমন ধারনা থাকায় প্রথম প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়। দ্বিতীয়ত এই লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করা গেলেও সেখানে কেবলমাত্র বিভিন্ন রাজার নাম ও পদবী, সময়কাল কিংবা রাজ্যাঙ্ক এবং স্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ফলে এর থেকে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেক কঠিন এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। অন্যদিকে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল তা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় ইতিহাসের সূত্র নিয়ে। বিশেষত, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাশাপাশি মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, সিল ও সিলমোহর থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু সূত্র পাওয়া গেলেও সাংস্কৃতিক তথ্য নিতান্তই অপ্রতুল। এই সীমাবদ্ধ ও অপ্রতুল তথ্যসূত্রের উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রসনাবিলাস সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা

* প্রভাষক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইতিহাসের সূত্র, সাহিত্যিক উপাদান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন একইসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে পদ্ধতিগত দিক থেকে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব দুটি বিষয়ের থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নৃ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে ইতিহাস বলতে যেমন ধারাবাহিক বর্ণনা, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বলতে যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন ও বিশ্লেষণ কিংবা নৃবিজ্ঞানের এথনোগ্রাফি, এথনোলজি, স্বাক্ষাতকার গ্রহণ, অবস্থানমূলক পর্যবেক্ষণ তার সরাসরি কোনোটাই এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়নি। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক ধারণাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় স্পষ্ট করতে দেখা গেছে কোন বিশেষ বিষয়গুলো মানুষের খাদ্যাভ্যাসকে নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Mead, Margaret, 1943:136–141)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে তাম্রশাসন শিলালিপিগুলো পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই তাম্রশাসন কিংবা লিপিগুলোর উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণের মত জটিল বিষয়ের গবেষণাকাজ সম্ভব নয় (Mead, Margaret, 1943: 136–141)। এজন্য ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মিশ্র পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করতে হয়েছে। যেহেতু অতীতকালে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা কিংবা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে দেখার একটা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে গবেষণা করতে হয় বর্তমান গবেষণায়ও তেমনি উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের উপযুক্ত বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রসনাবিলাস সম্পর্কিত নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করা হয়েছে। তবে কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষ কীভাবে তাদের খাদ্য প্রস্তুত করেছে এবং তাদের চাহিদা নিশ্চিত করেছে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Eggert, M.K.H., 1977: 242–55)।

প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি থেকে সহায়তা নিয়ে এখানে গবেষণার শুরুতে দুটি প্রশ্ন সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে– ১. কী করা হবে? ২. কীভাবে করা হবে। উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে বলা যেতে পারে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যভাস ও রসনাবিলাসের বিষয়টিকে। আর কীভাবে তথা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে প্রাথমিক সূত্র তথা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে প্রাপ্ত প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাশাপাশি মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক, সিল ও সিলমোহর থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণের বিষয়টিকে। আর এই কাজটি করার জন্য একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে (Aguilera, Jose Miguel and David W. Stanley, 1999: 131-136)।

বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, তুলনা এবং কারণ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে গবেষণাকর্ম এগিয়ে নেয়া হয়েছে। পরিচয় প্রদায়ক যুক্তি ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ডিডাকশন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইন্ডাকটিভ রিজনিং অনেকাংশে কার্যকর মনে হয়েছে (Flannery, K.V., 1976. :333–45)। বিশেষ করে

বিদ্যমান নানা সূত্রের মধ্যে কোনটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ, কগনিটিভ অ্যাপ্রোচ কিংবা প্রেক্ষিতগত বিশ্লেষণের মত বিষয়গুলো এই গবেষণা থেকে বাদ পড়েনি। হাইপোথেটিকো ডিডাকটিভ মডেল (The hypothetico-deductive model) বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক কার্যকর হলেও ইতিহাস গবেষণায়ও এর যৌক্তিক ব্যবহার সম্ভব (Hawkes, C.F.C., 1954. : 155–68)। বর্তমান গবেষণায় মূলত এই ধরনের নানা বিষয়ের সমন্বয় সাধনেরও একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার মানুষের খাদ্যাভাসের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় রাজক্ষমতায় পরিবর্তন মানুষের সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। যেমন, উদাহরণ হিসেবে মোগল আমলে এদেশের মানুষের বিশেষায়িত খাদ্যাভ্যাস সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত বিশেষ শিলালিপি থেকে সরাসরি না হলেও আপাত অনুমানের মাধ্যমে এ দেশে মৌর্য শাসনের কথা জানা গেছে। তবে মৌর্যরা সরাসরি বাংলার উপর দখল নিশ্চিত করতে পেরেছিল কিনা তা সুস্পষ্ট নয়। এর শুঙ্গ যুগের অল্পবিস্তর যে নিদর্শন পাওয়া যায় তার আলোকে এ যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্লিখন প্রায় অসম্ভব। কুষাণ আমলের বেশ কিছু মুদ্রা বাংলার নানা স্থান থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে গুপ্ত যুগের বাংলার ইতিহাস রচনার সূত্র হিসেবে বেশ কয়েকটি মুদ্রা, শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে এই অপ্রতুল তথ্যসূত্রের আলোকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার কাজটি বেশ কষ্টসাধ্য। একইভাবে গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের কয়েকটি মুদ্রা, সিল, শিলালিপি ও তাম্রশাসন পাওয়া যায় যা থেকে তার রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারণা মেলে। পাল ও সেন যুগের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসকদের অনেকগুলো শিলালিপি ও তাম্রশাসন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে এই আমলের ইতিহাস রচনার উল্লেখযোগ্য সূত্র রয়েছে। সবমিলিয়ে এ ধরনের অপ্রতুল, খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর গবেষণা করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

তথ্য ও উপাত্ত পরিচিতি

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার সূত্রগুলো থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্তমান গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে, প্রত্নবস্তু (Artifacts) চাকলাপুঞ্জী, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, ভরতভায়না, উয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি প্রত্নঅঞ্চলে পাওয়া প্রাচীন নিদর্শনগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত, সমকালীন সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক বিবিধ তথ্য এসব নিদর্শন থেকে গবেষণা করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রসনাবিলাস সম্পর্কে ধারণালাভের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষত, শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কারণ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে সমকালীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। বিভিন্ন স্থাপনা বা মূর্তির গায়ে উৎকীর্ণ

লিপি সরকারি বা বেসরকারি যাই হোক তা ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎকীর্ণ অধিকাংশ শিলালিপি যেমন ছিল রাজপ্রশস্তি তেমনি তাম্রশাসন তথা তামার পাতে উৎকীর্ণ লিপিগুলো ছিল ভূমিদানপত্র তথা ভূমির দলিল। এগুলো থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি অল্পবিস্তর ভূমির ধরন, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

পূর্ববর্তী গবেষণা

সরাসরি প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রসনাবিলাস নিয়ে গবেষণা না হলেও প্রাচীন বাংলার মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনাচার নিয়ে অনেক বিদগ্ধ গবেষক কাজ করেছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে সূত্র নিয়ে বৈষয়িক বিশ্লেষণের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে বাংলার কৃষি ইতিহাস নিয়ে যে গবেষণাগুলো হয়েছে সেখানে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে (রশীদ, ২০১৫-২০১৬ : ৩৪০-৩৪১)। বাংলাদেশের গ্রাম নিয়ে বিস্তৃত আঙ্গিকের গবেষণা করেছেন স্বপন আদনান। তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার গ্রাম সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলেও সেখানে প্রাচীন বাংলার গ্রাম সম্পর্কিত অধ্যয়নের দিকনির্দেশনা রয়েছে (Adnan, Shapan., 1990: 126.)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভূগোল নিয়ে আহমেদ নাফিসের গবেষণাকর্মটিও বেশ গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণের দাবি রাখে (Ahmad, Nafis., 1976: 139)। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন মানুষের সামাজিক অবস্থান বদলে দিয়েছিল। এই বিশেষ পরিস্থিতি তাদের খাদ্যাভ্যাসকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে (Calkins, Philip B.1990 : 3-30) । পাশাপাশি কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ কীভাবে সমাজের পুরো চালচিত্র পাল্টে দিয়েছিল তা নিয়েও কাজ করেছেন অনেক গবেষক (Chaudhuri, Binay Bhushan, 1992: 371-427)। অন্যদিকে কৃষিজ উৎপাদনের গতি প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এগিয়ে গেছে মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন (Chowdhury, Jahanara Huq , 1996: 69-84.)।

বাংলার কৃষক সমাজের মানুষ কী ধরনের সংগ্রাম করে তার চালচিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলার কৃষি ব্যবস্থার নানা বিষয় তুলে ধরেছেন ফিরোজ আহমেদ (Ahmed, Feroz, 1973: 419-48)। অন্যদিকে বাংলায় কৃষির বিকাশ নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। সেখানে ঐতিহাসিক পরিসরে বাংলার কৃষি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (Ahmed, Noazech, 1976.)। বাংলার কৃষি ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে অনিল চন্দ্র ব্যানার্জির গবেষণা অনেক গুরুত্ব সহকারে যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যযুগ নিয়ে তাঁর গবেষণাকর্মটি শেষ হলেও এখানে প্রাচীন বাংলা সম্পর্কিত আপাত ধারণা পাওয়া যায় (Banerjee, Anil Chandra. :1980.)। কৃষি উৎপাদন কীভাবে সামাজিক নেতৃত্ব নির্ধারণের মত জটিল কাজ করেছিল সেই বিষয় নিয়েও বিস্তৃত আঙ্গিকের গবেষণার কথা জানা যায়। এখানে নানা বিষয়ের পাশাপাশি কৃষিজ উপাদানের কথা রয়েছে। এই উপাদানগুলো তখনকার বাংলায় চাষ হওয়ার অর্থ হচ্ছে তা তখনকার মানুষের খাদ্য তালিকায় ছিল (Bhattacharya, Jnanabrata, 1978: 611-36.)। অন্যদিকে বাংলার কৃষিজীবী সমাজে প্রযুক্তির প্রভাব খতিয়ে দেখার চেষ্টাও করেছেন অনেক গবেষক (Boyce, James: 1987.)। তবে এ ধরনের গবেষণা প্রাচীন যুগ নিয়ে যতটা না হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি আধুনিক সময়কালনির্ভর (Guha, Sumit., 1995: 119-42.)।

গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন অনেক বিদগ্ধ গবেষক। এক্ষেত্রে তাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে (Islam, Sirajul, : 1977.)। বাংলাদেশের মানুষের কৃষিনির্ভর জীবনকাঠামো কীভাবে এর সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে তা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত ইঙ্গিত রয়েছে (Jannuzi, F. Thomasson. : 1980.)। এর পাশাপাশি কৃষিজাত পণ্য কীভাবে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে গিয়েও ক্ষেত্রবিশেষে বাংলার মানুষের খানাপিনা সম্পর্কিত তথ্য ফুটে উঠেছে (Stokes, Eric.,1976: 227-39.)।

প্রাচীন বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসন নিয়ে যে ক্যাটালগগুলো তৈরি করা হয়েছে তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে। ননীগোপাল মজুমদার বাংলার লিপিমালা সম্পর্কিত একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছেন (Majumdar : 1929.)। ভারত বাংলার ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিপিমালা নথিভুক্ত করেছেন দীনেশ চন্দ্র সরকার। তিনি সেখানে রাজনৈতিক ইতিহাস সহায়ক যে বর্ণনা রেখেছেন তার থেকেও সমকালিন কৃষি ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে (Sircar. D.C.: 1983.)। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়েও গবেষণা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিস্তৃত আঙ্গিকে ভারতের মানুষের খাওয়া দাওয়ার নানা বিষয় যুক্ত হয়েছে। বাংলার প্রেক্ষিতে গবেষণা করার ক্ষেত্রে এই ধরনের গবেষণাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে (Prakas: 1961)।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলায় ধান উৎপাদনের ইতিহাস অতি প্রাচীন (রশীদ, ২০১৫-২০১৬ : ৩৪০-৩৪১)। ফলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার মানুষের খাদ্য তালিকায় ভাত, চিড়া, মুড়ি কিংবা ছাতুর স্থান ছিল। বিভিন্ন লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক সময়কাল থেকে বাংলায় ধান চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিশ্লেষণ করে বাংলায় সেই পাথর যুগ থেকে শুরু করে আদি ঐতিহাসিক সময়কাল পর্যন্ত নানাভাবে ধান চাষের কথা জানা যাচ্ছে (দাশ, ২০১০ : ২৫)। বিশেষ করে বাংলা ও তার আশেপাশের এলাকায় লৌহ যুগে ধানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের তেলবীজের চাষ করা হয়েছে। ফলে মানুষ খাবার হিসেবে চালের তৈরি বিভিন্ন উপকরণ যেমন ব্যবহার করেছে, তেমনি রান্নার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম তেলের প্রচলনও ঘটেছিল (দাশ, ২০১০ : ২৮)। বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দিকেও এই অঞ্চলের মানুষ ধান চাষের সঙ্গে পরিচিত ছিল। অন্তত পুডনগল তথা পুণ্ড্রনগরের মহামাত্র দুমদিনের প্রতি শাসকের আহবান দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে দান দিয়ে সহায়তা করা হোক। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তখনকার সময়ে খাদ্য উপকরণ হিসেবে ধান কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল (Dineschandra Sircar, 1965: 79)।

বিভিন্ন প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে কয়লা জাতীয় উপকরণ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এর মাধ্যমে রেডিও কার্বন তারিখ নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রত্নস্থানের সময়কাল নির্ধারণ সহজ হয়ে যায়। পাশাপাশি এই পুড়ে যাওয়া উপকরণের প্রকৃতি থেকে তৎকালিন কৃষি সম্পর্কিত ধারণা লাভ করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মহিষদল প্রত্নস্থান থেকে প্রাপ্ত পোড়া ধানের অঙ্গার নিদর্শনের আলোকে বলা যায় সেখানেও ধান চাষ হতো (রায়, ২০১৪ : ৪৪৫)। ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান চন্দ্রকেতুগড়

থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকের আলোকে বলা যায় সেখানে একসময় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হতো। তাই তার গুরুত্ব আমলে নিয়ে ফসল কাটার উৎসবকে ঠাঁই দেয়া হয়েছে এখানকার টেরাকোটা ফলকে। এই বিষয়গুলোকে যুক্তিযুক্ত করেছে সমকালিন বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ। পাশাপাশি নানা ধরনের সাহিত্যিক সূত্র থেকেও এর প্রমাণ মিলেছে। একইভাবে সেনযুগের তাম্রশাসনে বিশেষ করে লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া তাম্রশাসনের ৪ ও ১০ লাইনে এই বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একইভাবে তার ছেলে কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনেও এই বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

কোনো স্থানের ভূমিরূপ মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে সেখানে মানব বসতি বিকশিত হয়। অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক অবস্থান ও পরিবেশ এক অর্থে মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিশ্চিত করে। আধুনিক ধারণা থেকে জানা যায় মানুষের সংস্কৃতি হচ্ছে অভিযোজনের দেহাতিরিক্ত মাধ্যম। এই অভিযোজন ঘটে থাকে পরিবেশের সাপেক্ষে যার সাথে ভূমিরূপের গঠন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যদিকে মানব-গোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ভূমিরূপ দখল করে সে অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবনযাপনের ফলে তখন ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় যে বিন্যাস সাধিত হয় প্রত্নতত্ত্বের ভাষায় সেটিই মানব বসতি-বিন্যাস। পরিবেশের নিয়ামক তথা ভূমিরূপের বিষয়টি মানুষের বসতি-বিন্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আর এই বসতি বিন্যাসের পাশাপাশি মানুষের খাদ্যাভ্যাসের বিষয়টিও অনেকাংশে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত।

একটি স্থানে এই সকল নিয়ামক যতদিন মানুষের বসবাসের অনুকূলে থাকে ততদিন ঐ স্থানে মানব বসতি টিকে থাকে। প্রকৃতি মানুষের বসবাস করার প্রতিকূলে যেতে থাকলে মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে অভিবাসনে বাধ্য হয়। নির্দিষ্ট স্থানে বিকশিত মানব বসতির সাথে সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত উপাত্ত যেমন চলমান জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার, বসতির ঘনত্ব, বসতির স্থানিক বিন্যাস, একটি বসতি হতে অন্য বসতির অবস্থানগত দূরত্বসহ নানাবিধ বিষয় মানুষ ও ভূমিরূপের আন্তঃসম্পর্ক দ্বারাই অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। একটি স্থানে মানব বসতি টিকে থাকে ভূমিরূপের সাথে মানুষের গড়ে তোলা সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বিকশিত মানব সংস্কৃতি এই সম্পর্ক টিকে থাকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সম্পর্কের এই ছন্দপতন সংস্কৃতির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংসের দিকেও ঠেলে দেয়। বিরূপ অবস্থান সৃষ্টি হলে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অভিবাসনে বাধ্য হয় কিংবা ঐ স্থানে থেকে পুরো সংস্কৃতি নিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে উক্ত স্থানে বসবাসরত মানুষের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই নির্ধারিত হয় প্রকৃতি থেকে। পাশাপাশি এই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির যে সম্পর্ক তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তাদের বসতি বিন্যাস ও জীবনযাত্রা। বাস্তবে তাদের খাদ্যাভ্যাসও এর অন্তর্গত।

সাম্প্রতিক গবেষণাতে বাংলাদেশের মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বসতি-বিন্যাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। মহাস্থানগড় করতোয়া উপত্যকায় বরেন্দ্র-ভূমিতে এবং উয়ারী-বটেশ্বর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মধুপুর গড়ের লাল মাটিতে

অবস্থিত। মহাস্থানগড় অঞ্চলে আদি ঐতিহাসিক যুগের দুর্গ-নগরীসহ প্রায় ১৩৩টি প্রত্নস্থল শনাক্ত করা গেছে যার প্রায় সবকটিই নদীর তীরে কিংবা নদীর নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। একইভাবে উয়ারী বটেশ্বরে আবিস্কৃত আদি ঐতিহাসিক যুগের নগর সভ্যতাসহ বিবিধ নিদর্শনগুলো আড়িয়াল খাঁ, গঙ্গাজলি ও কয়রা নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত। মহাস্থানগড়ের বসতি বিন্যাস বিশ্লেষণে করতোয়া নদী ও সামরাই বিলের অবস্থান প্রাচীন বসতিগুলোর সাথে এর ভূমিরূপের গভীর আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরতে যথেষ্ট। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় এই অঞ্চলের নদীতে প্রাপ্ত মাছের পাশাপাশি তার দুপাশের উর্বর ভূমিতে মানুষ যা চাষ করতো তাই তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহাস্থানগড় অঞ্চলের ১৩৩টি প্রত্নস্থানের মধ্যে ৭২টি প্রত্নস্থান করতোয়া নদী ও সামরাই বিলের তীরে হলেও অপেক্ষাকৃত উঁচু বন্যামুক্ত ভূমিতে অবস্থিত। অর্থাৎ প্রাচীন মানুষ মহাস্থানগড় অঞ্চলে বন্যামুক্ত ভূমিতে বসতি গড়ে তুলেছিল। এই অঞ্চলের প্রত্নস্থানসমূহ উচ্চভূমিতে পাওয়া গেলেও এগুলো নদী ও বিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। মৌসুমি বন্যা এই স্থানের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করলেও উঁচু স্থানে অবস্থিত মানব বসতির ক্ষতিসাধন করতে পারে না। এক্ষেত্রেও নদী থেকে প্রাপ্ত মাছ এবং নদীর দুই তীরের উর্বর ভূমিতে চাষকৃত ফসল ছিল মানুষের খাদ্যের উৎস। এদিক থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলেও দেখা যাচ্ছে মানুষের খাদ্যাভ্যাস প্রকৃতি নির্ধারিত।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বেশ কিছু অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ সৃষ্টি করেছে। এই হ্রদগুলো প্রয়োজনীয় পানির যোগান দিতে সক্ষম হওয়াতে অনেকগুলো বসতি এ সকল জলাশয়ের কাছাকাছি গড়ে ওঠে। তবে তুলনামূলক উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ায় এ সকল মানব বসতিচিহ্ন ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে সংঘটিত ভয়াবহ বন্যাতেও তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বলা যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট বন্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের অনেক স্থান মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রভাবেও প্লাবিত হতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি প্রবল বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পানি প্রবাহের ফলে নদীর পানি উপচে গিয়ে বাংলাদেশে বন্যা সৃষ্টি করে। তাই একই স্থানে উঁচু ও নিচু ভূমির অবস্থান এই দিক থেকে ঐ অঞ্চলের মানব বসতি টিকে থাকার মূল কারণ। উঁচু বন্যামুক্ত ভূমি একদিকে যেমন মানব বসতি টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে তেমনি নালাসদৃশ নিম্নভূমি ছিল পানি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে সহায়ক। এসব জলাভূমি বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস

বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রথম লিপিসূত্র হিসেবে ধরা হয়ে থাকে মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপিটিকে (Ramarajan Mukherjee, 1967: 39)। এই লিপিতে যেমন ধান চাষের কথা বলা হয়েছে তেমনি বাংলার মানুষের খানাপিনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একই বক্তব্য নীহাররঞ্জন রায়ের। তিনি মনে করেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে ধান যেহেতু এদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন শস্য তাই এখানে মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। তাঁর হিসেবে ‘ভাত ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষী

আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। উচ্চকোটির লোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নমত কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্যবস্তু ভাত এবং 'হাঁড়িত ভাত নাহি, নিতি আবেশী', ইহাই বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ! ভাত রাঁধার প্রক্রিয়ার তারমত্য তো ছিলই, কিন্তু তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ নাই বলিলেই চলে (রায়, ২০১৪: ৪৪৪)। অন্যদিকে মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত লিপি ধান চাষ সম্পর্কিত যে তথ্য দিচ্ছে তার সঙ্গে একে সহজেই মিলিয়ে নেয়া যায় (Ramarajan Mukherjee, 1967: 39)। একইভাবে লক্ষ্মন সেনের কিংবা তার ছেলের জারিকৃত লিপি থেকেও ধান চাষ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে (Nani Gopal Majumdar, 2015 :88-90)।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যে মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে প্রাচীন বাংলাদেশের লোকদের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা দেওয়া বেশ কঠিন। তবে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে সংগৃহীত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, প্রাচীন বাংলাদেশের লোকদের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস ছিল সাদামাটা। সূদূর অতীতকাল থেকে বাংলাদেশে ধান চাষ হতো। অনুরূপভাবে নদীবহুল বাংলাদেশে প্রচুর মাছও পাওয়া যেত (সেন (সম্পাদিত), পদ-৩৩ : ৯০)। তাই সুদূর অতীতকাল থেকেই ভাত ও মাছ ছিল বাংলাদেশের সব শ্রেণীর লোকদের প্রধান খাদ্য। প্রাচীন বাংলার মানুষ তাই সাধারণত ভাতের সাথে মাছ ও নানা প্রকারের শাক-সবজিকে তাদের খাদ্য তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিল। এ সময়ের মানুষের আদর্শ খাদ্য সম্পর্কে ১৪ শতকের দিকে রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গল থেকে একটি ধারণা পাওয়া গেছে। সেখানে কলাপাতা বিছিয়ে আদর্শ বাঙালি খাদ্য হিসেবে ভাত গ্রহণের কথা বলা হয়েছে (Chakravorty, Toponath, 1961: 14)। সেখানে উল্লিখিত ভাষ্য হচ্ছে- 'ওগ্‌গরা ভত্তা গাইক ঘিত্তা'। এর আলোকে অনেকে বিশ্লেষণ করেছেন কলাপাতা বিছিয়ে তার উপর ভর্তা ও ঘিয়ে মাখা গরম ভাত পরিবেশন করা হত। এর বাইরে প্রাকৃত পৈঙ্গল আরও বলছে– 'ওগ্‌গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা/মৌইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা খা (ই) পুনবন্তা'। নীহাররঞ্জন রায় এর অর্থ করেছেন (যার স্ত্রী কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, সুস্বাদু মৌরলা মাছ ও নালিতা (পাট) শাক নিত্য পরিবেশন করতে পারে সে ব্যক্তিই পুণ্যবান (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৪)।

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে পরিচিত এই প্রাকৃত পৈঙ্গলে চরণটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, প্রাচীন বাংলার মানুষ মূলত কলাপাতায় গরম ভাতের সাথে গাওয়া ঘি, সুস্বাদু মৌরলা মাছ ও পাট শাক খাবার হিসেবে গ্রহণ করত। তবে সামাজিকভাবে আয়োজিত বড় খানাপিনায় তারা সাদামাটা খাবার পছন্দ করত না। তারা বিয়ের মত অনুষ্ঠানে জমকালো নানা খাবারের আয়োজন করত। তখন তাদের খাবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা গেছে ভাত, মাছ, ঘি, মাংস, সবজি, দুগ্ধজাত খাবার এবং নানা রকমের মিষ্টি ও ফল (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৪)। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি, মাছ ও মাংসের তরকারিও তাদের পছন্দের তালিকায় ছিল। তবে আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় হচ্ছে তখনকার মানুষ নানা ধরনের শাক যেমন, গিমা, শীতল গিমা, হেলেঞ্চা, পালং, কলমি, পুঁই, ভেতুয়া, তিতপোরোলা, পাট শাক, লাউ শাক, কুমড়ার ডগা, ঢোলকলমির আগা, থানকুনি, খাসিয়া, পলতা, মধুলতা, ঢলুয়া, সরুপা, সোনাকচু, পানিকচু, তেলাকচু, ওকরা, ধনিয়া, নাটুয়ার ফনা প্রভৃতি ভাতের সঙ্গে খাওয়ার অভ্যাস করেছিল (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৭)। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় তখনকার প্রাকৃতিক

পরিবেশে এ ধরনের বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মাতো যার পাতা ছিল নরম ও রসালো এবং সহজেই শাক হিসেবে খাওয়ার উপযোগী। বিশেষ করে বিভিন্ন তাম্রশাসনে জলাভূমির উল্লেখ থাকায় এই অনুমান করা যায় (ভট্টাচার্য, ডি সি, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ : ৪১.৪৫)। অন্তত শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসনের ভাষ্যে দানকৃত ভূমির সীমারেখা নির্ধারণে মূলত জলাভূমিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে (Sircar, 1947: 226)।

প্রাচীন বাংলার ভূমিরূপ বিশ্লেষণ করলে অনুমান করা যেতে পারে সেখানে কী ধরনের ফসল জন্মাতে পারে। অন্যদিকে প্রাচীন বাংলার পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণা থেকে ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই অঞ্চলের মানুষ কী ধরনের ফসল উৎপাদনে সক্ষম ছিল (Alam 1991 : 25 – 32.)। এর সঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বর্ণিত ধারণাগুলো মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন বাংলার মানুষের উৎপাদিত সবজির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, কাঁকর কচু, ঝিঙ্গা, বরবটি, পটোল, মুলা, ধুন্দুল প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এগুলো মানুষের নিরামিষ খাবার হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিল (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৪)। তবে এ ফসলগুলোর উৎপাদন শুধু নয় রান্না করার দক্ষতাতেও এগুলো সুস্বাদু তরকারিতে পরিণত হতো। এ ছাড়া খাদ্য তালিকায় নানা ধরনের শাক-সবজির বহু বর্ণিল উপস্থিতি রসনা রসিকদের রুচি-বৈচিত্রের পরিচয় বহন করে যা অনেকাংশেই বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ধরনের সবজির পাশাপাশি প্রাচীন বাংলায় রুই, কাতল, পাঙ্গাস, বোয়াল, চ্যাং, শোল, গজাল, কৈ, চিতল, উপাল, শিং, মাগুর, ইলিশ, পাবদা, রূপচাঁদা, সরপুটি, শফর, মৌরলা, মোইনি, নলমিনা, ভেটকি, ফলুই, সোনাখড়কি, চেলা, কালবাউশ, বাঁশপাতা, টেংরা, ভেদা, খৈলসা ইত্যাদি মাছ রান্না করা হতো। তখন চিংড়ি এবং কাঁকড়াও বেশ উপাদেয় খাদ্য হিসেবে অনেকের খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। তবে তখনকার দিনে যত মাছই থাক তার মধ্যে সেরা হিসেবে মনে করা হয় ইলিশকে। প্রচুর উৎপাদনের পাশাপাশি সেসব ইলিশ ছিল সব দিক থেকে অতুলনীয় (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৭)।

বাংলার পরিবেশ নানা দিক থেকে মাছ উৎপাদনে সহায়ক ছিল (Curray, Joseph., 2014: 352.)। তবে উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে (Biswas, B., 1961: 138) সংগ্রহ করার পর মাছ বেশিক্ষণ খাওয়ার উপযোগী থাকত না। ফলে মানুষ মাছ সংরক্ষণের জন্য শুঁটকি করে রাখত। অনেক ইতিহাসবিদ এই শুঁটকিকে বেশ সুস্বাদু খাবার হিসেবে উল্লেখ করেছেন (Majumdar (ed.) : 612.)। পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে এখনও শুটকি মাছকে প্রিয় খাদ্য হিসেবে স্থান দিয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা পড়তো একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে (আবেদীন, ১৯৯৪ : ৮১-১০৬)। পরবর্তী সময়ের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ প্রথম দিকে মাছ শুঁটকিকরণ শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে তা আস্তে আস্তে খাবার হিসেবে তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী হয়ে উঠেছে।

বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসেব করলে এখানে পশুদের উপস্থিতি ছিল কম। তার মধ্যে থেকে মাংস সংগ্রহ করে খাওয়ার মত গৃহপালিত প্রাণির সংখ্যাও ছিল কম। অন্যদিকে বৈদিক যুগের পর থেকে ভারতবর্ষের মানুষের মত বাংলাতেও সেভাবে গরুর মাংস খাওয়ার প্রচলন ছিল না। তাই এসব দিক বিশ্লেষণ করে মানুষের তৎকালীন খাদ্য তালিকায় মাংসকে অনিয়মিত খাদ্যদ্রব্য হিসেবে চিহ্নিত করা

যেতে পারে। তখন মানুষ যে প্রাণিগুলোকে সহজলভ্য মনে করেছে তার মাংস খাবার হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ছাগল, হরিণ, ভেড়া, মোরগ, কবুতর, বক, সারস ও অন্যান্য পাখির মাংস ছিল উল্লেখ করার মত। অন্যদিকে সমাজের অভাবী মানুষ তার চোখের সামনে যে প্রাণির মাংস পেয়েছে সেটাই খাবার হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে অনেক ইতিহাস গবেষকের অভিমত। তাদের খাদ্য তালিকায় অদ্ভুতভাবে বেজি, গোসাপ, শকুন, খরগোস, ইঁদুর, সজারু, কচ্ছপ, শূকর প্রভৃতির মাংস উপস্থিত থাকতো। তবে সমাজের প্রায় প্রত্যেকেই প্রিয় খাবার হিসেবে ছাগলের মাংসে অভ্যস্থ হয়েছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে তাদের কাছে হরিণের মাংস অনেক প্রিয় ছিল (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৬)।

তবে নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনা মতে 'পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে লোকেরা হাঁস-মুরগির ডিম পছন্দ করত। লবণ-মরিচ দিয়ে ঝোল করে ডিমের তরকারি তাদের খুব প্রিয় খাদ্য ছিল। তারা কচ্ছপের ডিম সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করত। এছাড়া, ঘন্ট, ঝাল-চচ্চরি ছিল সবার প্রিয় খাদ্য। নিম, শিম, বেগুন ও বেতের আগার সাথে ছোট মাছ মিশিয়ে তৈরি তরকারিও তাদের খুব প্রিয় ছিল। মহিলাদের সাধভক্ষণের সময় (গর্ভবতী মহিলাকে তার পছন্দ অনুযায়ী খাবার দেওয়ার অনুষ্ঠান) অনেক মুখরোচক খাবার তৈরি করা হতো। এসব খাবারের মধ্যে ছিল বাথুয়া শাক, আমড়ার সাথে লাল শাক, কাসুন্দির সাথে বরই, করমচার টক প্রভৃতি। স্বচ্ছল পরিবারের লোকদের নিকট নানা প্রকারের খাবার খুবই প্রিয় ছিল। প্রস্তুত করা হতো ষোড়শ ব্যঞ্জন, তেইশ ব্যঞ্জন, ত্রিশ ব্যঞ্জন, বত্রিশ ব্যঞ্জন, ছত্রিশ ব্যঞ্জন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ইত্যাদি। এসব ব্যঞ্জনের মধ্যে থাকত বেশ কিছু সংখ্যক ভাজা-পোড়া তরকারি। লোকেরা বেগুন, করলা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল প্রভৃতি ভেজে দারুণ তৃপ্তিসহকারে খেত। তারা ওল, বেগুন প্রভৃতি সবজিও পুড়িয়ে আনন্দের সাথে খেত।' তিনি কোন বিশেষ সূত্র থেকে এই কথাগুলো লিখেছেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট করতে পারেননি। তবে তাঁর এই বর্ণনার সঙ্গে কিছু শিলালিপি ও তাম্রশাসনের কিছুটা মিল পাওয়া যায় (Majumdar, Vol.3: 88-90)।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন 'বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ধনী ব্যক্তিরা নানা ধরনের জমকালো খাবারের আয়োজন করত। এসব খাবারের মধ্যে থাকতো ভাত, পরোটা বা রুটি, বিভিন্ন রকমের তরকারি, নানা ধরনের শাক-সবজি, মাছ, মাংস, দই, ঘি এবং হরেক রকমের পিঠা, মিষ্টান্ন ও ফল-ফলাদি। এসব ভোজে অতিথিদেরকে কর্পূর দেওয়া সুগন্ধি পানি এবং নানা রকমের মশলাদার পান দেওয়া হতো। এ ধরনের ভোজসভায় এত রকমের তরকারি পরিবেশন করা হতো যে, অতিথিগণ তা খেয়ে শেষ করতে পারত না। এমনকি, কখনও কখনও তারা রকমারি তরকারির সংখ্যাও গুণে শেষ করতে পারত না (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৭)। তিনি ই-ৎসিঙ-এর বর্ণনায় এ ধরনের ভোজসভার আয়োজনের বিবরণ দেখতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ আচারকে পছন্দের তালিকায় ঠাঁই দিয়েছে নানা কারণে। তারা খাবারের সঙ্গে এই আচার যেমন বেশ পছন্দ করত এবং তা প্রচুর পরিমাণে খেত (Curray, Joseph. 2014 : 352.)।

বাংলার উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে কোনো ফল বেশিদিন টিকে থাকতো না। তাই গ্রাম বাংলার মানুষ এই ফল সংরক্ষণের জন্য নানা ধরনের আচার তৈরি করত। বিশেষ করে আম থেকে আমসত্ব, আমসি, চালতা ও

মান্দারের আচার তৈরি তখন প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রিয় ছিল নানা ধরনের মিষ্টান্ন। প্রতিদিনের রসনার পাশাপাশি উৎসবের খাবার হিসেবে বিভিন্ন পিঠা ও মিষ্টান্ন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখনকার মানুষ দুধ, দই, ক্ষীর, ঘি, ছানা প্রভৃতি দিয়ে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন ও পিঠা তৈরি করত বলে নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলায় মানুষের প্রিয় খাবারের তালিকায় ছিল খাজা, মোয়া, নাড়ু, বাতাসা, কদমা, মতিচুর, খইচুর, জিলাপি, রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি। গুড় ও চাল দিয়ে তৈরি ক্ষীর নামে পরিচিত একধরনের সুস্বাদু মিষ্টান্ন সমাজের সব শ্রেণির কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পায়েস নামে আরেক ধরনের মিষ্টান্নও বেশ প্রচলিত হয়েছিল যেখানে গুড়ের বদলে চিনিসহকারে দুধ ও চাল ব্যবহার করা হতো (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৬)। বাংলার হরেক রকম পিঠাপুলির কথা বিভিন্ন লোককথা ও লোকগাথায় পাওয়া যায়। মূলত চালের গুড়ার সাথে গুড়, ঘি, দুধ, চিনি, নারকেল প্রভৃতি মিশিয়ে নিয়ে তাকে প্রয়োজনমতো জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হতো নানা ধরনের পিঠা। প্রাচীন বাংলার মানুষ ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি, নারকেলপুলি, তিলাপিঠা, তালপিঠা, পুলিপিঠা, পাতাপিঠা, বড়াপিঠা, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধকলমি, সেমাইপিঠা তৈরি করত। তখনকার দিনে দুধের পঞ্চপিঠা ছিল গর্ভবতী মহিলাদের অপরিহার্য খাবার। পাশাপাশি অতিথি আপ্যায়নেও বিভিন্ন রকম পিঠার জুড়ি ছিল না।

বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদিত হতো। আম, কলা, কাঁঠাল, তাল, জাম, নারকেল, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, করমচা, ডালিম, তরমুজ, কমলা, আঙ্গুর, আমলকি, জলপাই, বেল, কদবেল, আতা, মেওয়া, ডেউয়া, পানিফল, খেজুর, লিচু, বাঙ্গী প্রভৃতি ফল প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল (রায়, প্রাগুক্ত : ৪৪৬)। গ্রাম বাংলার মানুষ চাল থেকে তৈরী মুড়ি, চিড়া ও খৈ দিয়ে নাস্তা করত। শ্রমজীবীগণ সকালে কাজে যাওয়ার পূর্বে পান্তাভাত লবণ ও মরিচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করেছিল। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সহজেই ভাত সংরক্ষণ করা যেত। এর বাইরে খাবার হিসেবে লোকেরা দুধ, দই, মাখন ও ননী খেত। চাঁপাকলা ও আমের সাথে ঘন দুধ মিশিয়ে ভাত দিয়ে খাওয়ার অভ্যাসও ছিল অনেকের। চিড়া ও চাঁপাকলার সাথে দুধের সর কিংবা দই খাওয়া অনেকের কাছে বেশ লোভনীয় ছিল। তবে তখনকার মানুষের কাছে দই ছিল অনেকাংশে আদর্শ খাবার। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন দইয়ের সাথে দুধ ও ক্ষীর মিশিয়ে তৈরি বিশেষ একধরনের খাবার প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। দইয়ের বাইরে দুধ হতে ননী, ছানা, ঘোল, মাঠা প্রভৃতি তৈরি করা হতো। অন্যদিকে আটা, পাকা কলা, ঘি, চিনি, দই প্রভৃতি দিয়ে তৈরী হালুয়া প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত ছিল। খাওয়ার পরে অনেকের অভ্যাস ছিল পান চিবুনো। তারা পানে চুন, সুপারি ও কর্পূর ব্যবহার করতো (Majumdar (ed.) : 612.)। এর বাইরে দুধ, ডাবের পানি, আখের রস ও তালের রস পানীয় হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল (রায়, ২০১৪: ৪৪৪)। এর বাইরে অনেকে ভাত পচানো মদ খেয়ে নেশা করত (রায়, ২০১৪ : ৪৪৭)।

প্রাচীন বাংলায় বাঙালির খাদ্য তালিকায় আমিষ ও নিরামিষ দুই ধরনের খাবারের স্থান ছিল। তবে তাদের প্রধান খাদ্য ভাত রান্নার জন্য চাল পানিতে সিদ্ধ করলেই হয়ে যেত। তবে ভাত তৈরি করার পর তা খাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেখা দিত বিভিন্ন রকম তরকারির। বিশেষ করে সাদা ভাত তরকারি ছাড়া

খাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে তরকারি হিসেবে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার বিস্তার লাভ করে। মাছ ও মাংস আমিষ জাতীয় এবং নানা জাতের শাকসবজি, ফলমূল, লতা, ফুল, বিচি ইত্যাদিকে মনে করা হতো নিরামিষ জাতীয় খাদ্য। আমিষ ও নিরামিষ আলাদাভাবে, আবার মিশ্রিতভাবে রান্না করতে দেখা গেছে (Raghuvamsa; Kalidasa: 81.)। অন্যদিকে মাছ স্বতন্ত্রভাবে ঝোল তরকারি কিংবা ভাজা করে খাওয়া হতো। আবার কেউ কেউ মাছ ভুনা করে রান্নার সময় তাতে আলু, বেগুন, পটল, লাউ, ঝিঙ্গা, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা কলা, ফুলকপি, টমাটো, এমনকি শাকও মিশ্রিত করতো। সবজি হিসেবে মানুষের খাদ্য তালিকায় আরও ছিল চাল কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, বরবটি, কচু, মানকচু, শশা, গাজর, বাঁধাকপি, কাকরোল, ধুঁন্দুল, কলার থোড় ও মোচা ইত্যাদি। অন্যদিকে শাক হিসেবে পালংশাক, পুঁইশাক, নটেশাক, নালিতা বা পাটশাক, ছোলাশাক, সজিনাশাক, কচুশাক, কুমড়োশাক, কলমিশাক, ডাঁটা, ডাঁটাশাক, লালশাক, শিম, মুলা, কচুর লতি, গিমা শাক ও শাপলার ডাঁটা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল (রায়, ২০১৪ : ৪৪৭)। সবমিলিয়ে বাংলার এ অঞ্চলে যা প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া গেছে কিংবা মানুষ উৎপাদন করতে পেরেছে তা সবার খাদ্য তালিকায় ছিল (আবেদীন, ১৯৯৪ : ৮১-১০৬)।

ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও মহাভারত ও রামায়ণ, চর্যাপদ অপভ্রংশ সাহিত্য, পাল ও সেন যুগের লেখকদের লেখনী হতেও এ সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। এ তথ্যগুলোর পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের উপযুক্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলে তার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা পাওয়া যেতে পারে। হিউয়েন সাংয়ের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, প্রাচীন বাংলার মানুষ ভাত, মাছ ও মাংসের পাশাপাশি নানা ধরনের শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, হরেক রকমের পিঠা খেতে পছন্দ করত। তবে ভাতই ছিল এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য। তবে প্রাচীন বাংলার মানুষ খুব সম্ভবত ডালের সাথে তেমন একটা পরিচিত ছিল না। মধ্যযুগে লিখিত বিভিন্ন বাংলা সাহিত্যে খাদ্য তালিকায় ডালের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ডালের প্রচলন পরবর্তী সময়ে বাংলায় শুরু হয় (Chakravorty, Toponath, 1961: 28-29)। প্রাচীন বাংলার মানুষের মাছ এবং মাংস খাওয়ার উপরে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়মের প্রবর্তন করা হয়েছিল। যেমন ব্রাহ্মণদের যে সকল মাছের মাথা দেখতে অনেকটা সাপের মতো এবং যে সকল মাছ গর্তে বসবাস করে সেগুলো খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এর পাশাপাশি একাদশী অমাবস্যা ও পূর্ণিমার রাতে ব্রাহ্মণদের মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণদের খানাপিনা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে স্মৃতিগ্রন্থের লেখকরা নানা রকম মাছের নাম তাদের বর্ণনায় স্থান দিয়েছিলেন। যেমন, রুই, শেল, মাগুর, সঙ্গী, সাফারা, মৌলি বা মৌরলা প্রভৃতি। এছাড়া তাদের লেখায় তিমি মাছ এবং কাঁকড়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় (Chakravorty, Toponath, 1961: 29-41)। মাছে ভাতে বাঙালি নামে পরিচিতি পেলেও প্রাচীন বাংলার মানুষ তিমি মাছের মত বিশাল আকৃতির মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত না (Chakravorty, Toponath, 1961: 41)।

সাধারণ মানুষ ছাগল, ভেড়া, হরিণ, কবুতর ও খরগোশের মাংস খেতে পছন্দ করত। তবে স্মৃতি কারকরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পশুর বুকের খাঁচা এবং শুকনো মাংস খেতে নিষেধ করতেন। এছাড়াও সজারু, কচ্ছপ ও পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রাণির মাংস খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য নিষেধ ছিল না। মৃত

শামুক, পাখি, সারস, হাঁস, উট, বন্য শূকর ও গরুর মাংস খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা স্মৃতিকারকদের প্রবর্তিত খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কিত এ সকল বিধিনিষেধ তেমন একটা মেনে চলতেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের খাওয়া দাওয়ার বেশ পার্থক্য ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য পেঁয়াজ, রসুন এবং মাশরুম খাওয়া নিষিদ্ধ না থাকলেও তা ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (Chakravorty, Toponath, 1961: 41)।

বিদেশী পরিব্রাজক যেমন- ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং এবং শেংচি বাংলা ভ্রমণে এসে প্রাচীন বাংলার নানা বিষয় সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের রচনাগুলোতে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও নানা উপাদান পাওয়া যায়। মূলত সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্ম প্রচারের জন্য তার সাম্রাজ্যের নানা স্থানে অসংখ্য স্তম্ভ নির্মাণ করেন। পাশাপাশি তাঁর সময়ে অনেক বৌদ্ধ বিহারও নির্মিত হয়েছিল। এই বিহারগুলোর পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত স্থাপনাগুলোর পরিদর্শনের জন্য বিশ্বের নানা স্থান থেকে পর্যটকরা বাংলায় আসতে থাকেন। তারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি বাংলা ভ্রমণে এসে সূত্রাদি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার থেকে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে তার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার খানাপিনা ও রসনাবিলাস সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার

বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশে সহজলভ্য উদ্ভিজ ও প্রাণিজ উপকরণ থেকে যেগুলো খাবার হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য বাঙালি তার প্রায় প্রতিটি উপকরণ তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান দিয়েছে। প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু বিচ্ছিন্ন সূত্র পাওয়া গেলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সূত্র তুলনামূলক নেই বললেই চলে। তাই প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা কী কী খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করতো তার ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করা অত্যন্ত জটিল একটি কাজ। এর মূল কারণ ঐতিহাসিক সূত্রের অভাব। তবে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায় সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণে প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে একটি রূপকল্প দাঁড় করানো সম্ভব। প্রাচীন বাংলার মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিনির্মাণে প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রের পাশাপাশি যে সকল সাহিত্যিক উপাদান আমাদের সাহায্য করতে পারে সেগুলো হলো- জৈন এবং বৌদ্ধসাহিত্য, শ্রুতিকথা বা স্মৃতিকথা অর্থাৎ স্মৃতিকারদের লেখা যেমন, মনুর সংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বাৎসায়নের কামসূত্র। অন্যদিকে, কালিদাসের লেখা এবং বিদেশি লেখকদের রচনা থেকেও এসম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারা যায়। এ তথ্যগুলোর পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তখনকার মানুষের খানাপিনা এবং রসনা সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলো ভূমিদানের দলিল হলেও সেখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে যা এই গবেষণা কাজকে সহজ করে দিয়েছে। সবমিলিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মতো এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাসও অনেকাংশে রাজনৈতিক ইতিহাস দ্বারা

প্রভাবিত। আর এই খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠেছিল বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রেখে।

সহায়ক তথ্যসূত্র

Alam, M.M., 1991. *Paleoenvironmental study of the Barail succession exposed in northeastern Sylhet, Bangladesh*. Bangladesh J. Sci. Res. 9,

Aguilera, Jose Miguel and David W. Stanley. *Microstructural Principles of Food Processing and Engineering*. Springer, 1999.

Adnan, Shapan. *Village Studies: Bangladesh, 1840-1890*. Dhaka: 1990.

Ahmad, Nafis. *A New Economic Geography of Bangladesh*. New Delhi: 1976.

Ahmed, Feroz. "The Structural Matrix of the Struggle in Bangladesh." In *Imperial Revolution in South Asia*, Editors Kathleen Gough and Hari Sharma, 419-48. New York: 1973.

Ahmed, Noazech. *The Development of Agriculture in Bangladesh*. Dacca: 1976.

Banerjee, Anil Chandra. *The Agrarian System of Bengal 1582-1793*. Calcutta: 1980.

Bhattacharya, Jnanabrata. "An Examination of Leadership Entry in Bengal Peasant Revolts, 1937-1947." *Journal of Asian Studies* 37, no. 4 (1978): 611-36.

Boyce, James K. *Agrarian Impasse in Bengal: Institutional Contraints to Technological Change*. New York: 1987.

Calkins, Philip B. "Collecting the Revenue in Early 18thC. Bengal: Fron the Cultivator to the Zamindar." *Mich State U, Asian Stud Center. S Asia Series, Occ Paper #16 " Bengal Change and Continuity*: 3-30.

Chakravorty, Toponath, Food and Drinks in Ancient Bengal, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1961, pp. 28-29

Chaudhuri, Binay Bhushan."Commercialization of Agriculture." In, History of Bangladesh, 1704-1971 Sirajul Islam, 371-427. Dhaka: 1992.

Chowdhury, Jahanara Huq. "The Effect of Sedentarization on a Nomadic People." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* 41, no. 1 (1996): 69-84.

Chippindale, C., 1992. *Grammars of archaeological design, in Representations in Archaeology*, eds. Gardin, J-C. & Peebles, C.S.. Bloomington & Indianapolis (IN): Indiana University Press.

Curray, Joseph. (2014). The Bengal Depositional System: From Rift To Orogeny. Marine Geology.

Dineschandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization: Vol 1, Calcutta, University of Calcutta, 1965.

Eggert, M.K.H., 1977. *Prehistoric archaeology and the problems of ethno-cognition*. Anthropos.

Flannery, K.V., 1976. *Contextual analysis of ritual paraphernalia from formative Oaxaca, in The Early Mesoamerican Village,* ed. K.V., Flannery. New York (NY): Academic Press,

Hawkes, C.F.C., 1954. *Archaeological theory and method: some suggestions from the Old World. American Anthropologist* 56(1), 155–68.

Jannuzi, F. Thomasson. *The Agrarian Structure of Bangladesh: An Impediment to Development*. Boulder: 1980.

Islam, Sirajul. *Rural History of Bangladesh: A Source Study*. Dacca: 1977.

Mead, Margaret. “The Factor of Food Habits.” *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 225, 1943.

Nani Gopal Majumdar, (Ed. With translation and Notes), Inscription of Bengal Vol.3,

Guha, Sumit. "Agrarian Bengal, 1850-1947: Issues and Problems." *Studies in History* 11(NS), no. 1 (1995).

ajumdar, N.C. (ed.), *Inscriptions of Bengal,* Vol. iii, Varendra Research Socieiy, Rajshahi, 1929.

Sircar. D.C. (ed.). *Select Inscriptions bearing on Indian liistory and Civilisation – From Sixth to the Eighteenth Century AD, Vols,.* I & II, Motilal Banarasidas, Delhi. 1965 &.1983.

Om Prakas, Food and Drinks in Ancient India: From Earliest Times to C. 1200 A.D. Front Cover, Munshi Ram Manohar Lal, 1961

Stokes, Eric. "Dynamism and Enervation in North Indian Agriculture: The Historical Dimension." *Bengal Past and Present* 95, no. 1, 1976.

S.J. Knudson. Culture in Retrospect. Chicago, 1978.

Trigger, Bruce G. "Settlement Archaeology. Its Goals and Promise." *American Antiquity*, vol. 32, no. 2, 1967.

Ramarajan Mukherjee, Corpus Of Bengal Inscriptions, first edition, Calcutta 1967.

D. C. Sircar, The Kailan Copper plate Inscription of King Sridharana Rata of Samatata, Indian Historical Quarterly, September 1947.

Biswas, B., 1961. Geology of the Bengal Basin with Special Reference to Stratigraphy and Micropaleontology. Unpublished Ph.D. Dissertation, Univ. of Calcutta.

R.C. Majumdar (ed.), *HB*-1.

* Raghuvamsa; Kalidasa, (canto IV-conquest of eastern India by Raghu, Bengali edition ofthe works of Kalidasa Published by Navapatra Prakashan, Calcutta).

অনিরুদ্ধ দাশ, দীর্ঘস্থায়ী কৃষি বিকাশ: ঐতিহাসিক পটভূমি ও আধুনিক সভ্যতার দায়, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১০

এম. জয়নুল আবেদীন, প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে স্টাডিজ জার্নাল, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে স্টাডিজ, রাজশাহী, ১৯৯৪

পতঞ্জলি, ব্যাকরণ-মহাভাষ্য: পস্পশাহ্নিক, (অনুবাদ ও সম্পাদনা দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম), কলিকাতা, আদ্যপীঠ, ১৯২৫

সুকুমার সেন (সম্পাদিত), চর্যাগীতি পদাবলী, পদ-৩৩

ভট্টাচার্য, ডি সি, নবাবিষ্কৃত রাত শাসন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (৫৩/৩-৪), কোলকাতা

মো. শাহীনুর রশীদ, বাংলার সনাতন কৃষি-প্রযুক্তির ইতিহাস: প্রসঙ্গ ধানভানা, ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৩৭-৩৮, ১৪২২-১৪২৩/২০১৫-২০১৬